সর্পিলাকার থ্রিলার উপন্যাস

গিরগিটি : ওয়াদা পর্ব

শিশুমনা পাঠকদের সর্তকীকরণ বার্তা:	
বয়সসীমা সর্বনিম্ন - ২০	শুধু পরিপক্ক মানসিকতার পাঠকের জন্য রচিত।

আনন্দ পাওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশই বারোমাসি পাঠের একমাত্র লক্ষ্য।

©
বারোমাসি প্রকাশনী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
[বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম
(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/
পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।]

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্দ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক ঊনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ সংবিধান, পৃষ্ঠা ১

বি.দ্র. : সংবিধানের মতো গুরুগম্ভীর ও কেতাবি বিষয়কে সাহিত্যের বইতে দেওয়ায় এটা পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকদের চক্ষুশূলের কারণ হতে পারে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমনকি শিক্ষাক্রমেও রাষ্ট্রের দর্পণ ‘সংবিধান’-এর সংযুক্তি হয় না বলে, যুবসমাজ বই পড়লেও তারা এ-সম্পর্কিত পাঠে মোটেও আগ্রহী হয় না। আর চাকরির সুবাদে কেউ কেউ সংবিধান পড়লেও, সংখ্যাটা নিতান্তই কম। আর তাই *লেখক-কবি-প্রকাশক* হিসেবে আমি বইয়ের শুরুতে প্রস্তাবনা-পর্ব দিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে আগ্রহ জন্মাতে চাই এবং পাশাপাশি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে এর অন্তর্ভুক্তি চাই।

গিরগিটি : ওয়াদা পর্ব

ফয়সল

বি. দ্র. :

বইয়ের সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই, তবে স্মৃতিচারণে মিলালেও মিলতে পারে! কোথাও কিংবা কারো সাথে মিলে গেলে, তা নিতান্তই কাকতালীয়। তবে সর্তকবাণী এই যে, ঘটনা ও প্রেক্ষাপটগুলোকে একত্রে সম্মিলিত করে পুরোনো তথ্য-উপাত্ত খুঁজতে যাবেন না। এতে আপনার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হতে পারে! ধন্যবাদ।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

গিরগিটি : ওয়াদা পর্ব

ফয়সল

গ্রন্থস্বত্ব©লেখক

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৪৩১

জানুয়ারি, ২০২৫

রজব, ১৪৪৬

প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন

GIRGITI: OYADA PORBO

FOYSAL

Copyright @MKSF

মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২

অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :

বারোমাসি

মুদ্রাক্ষরিক : লেখক

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা

বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা

বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : একশত পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র **: US $2**

ISBN: 978-984-99551-6-0

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :

www.facebook.com/baromashi

www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গপত্রের কথা

এই অংশের প্রত্যেক সত্তাই আমার অপরিচিত। কাউকেই আমি সামনাসামনি দেখিনি। শুধু তাদের ব্যাপারে পড়েছি, নানান জায়গা থেকে। অনেকটা, *নানান মুনির নানান মত*-এর মতো, ফলে নানান ধোঁয়াশা-কুয়াশা ছড়িয়ে ছিলো।

কিন্তু হুট করে একদিন, না, ঠিক একদিন না, দীর্ঘ ১৫ বছরের বীভৎস যন্ত্রণা আর দুঃস্বপ্ন শেষে, উৎসর্গপত্রের সত্তারা ও তাদের পরিবারবর্গ আনন্দে কেঁদে উঠে! এখন উনারা অপেক্ষায় আছেন সুবিচার, ন্যায়বিচার ও প্রাপ্তবিচার নামের অমবস্যার চাঁদের দিকে। পাবে কি?

২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাযজ্ঞে শহীদ হওয়া প্রত্যেক সদস্য,
২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে'র গণহত্যায় শহীদ হওয়া প্রত্যেক সদস্য,
২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে শহীদ হওয়া প্রত্যেক সদস্য,
২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া প্রত্যেক সদস্য,

এবং

২০০৯ সালে ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য আহত ও নিহত, আদতে খুন হওয়া প্রতিটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সাধারণ জনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ, বিশেষত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও এর অঙ্গসংগঠন এবং অন্যান্যরা—

এমনকি বাংলাদেশ আওয়ালীগ লীগ-এর রাজনীতি করা মানুষগুলো, যারা একটি আর্দশকে বিশ্বাস করে জনতা, সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো এবং বিনিময়ে যারা খুন হয়েছিলো—

তারা প্রত্যেকেই এই উৎসর্গপত্রের একেকজন প্রাপক।

'গিরগিটি'রূপী স্বৈরাচার, খুনী ও ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের সদস্যদের 'স্বজন হারানোর বেদনা'র গল্পের মূল ওয়াদা যখন উন্মোচিত হয়, অর্থাৎ ঠিক কী কারণে তারা ক্ষমতার মসনদ দখল করে রেখেছিলো, তা জানার পর, লিখিত হয় নতুন এক ইতিহাস। সত্যের উপর লেখা ইতিহাস। আপনাদের সবার আত্মত্যাগ আমায় শিখিয়েছে কী, কীভাবে ও কেন-এর জবাব; ইন শা আল্লাহ, ব্যর্থ যাবে না উৎসর্গপত্রের প্রাপকদের রক্ত। কথা দিচ্ছি!

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

সুমসুম—

ফাহমিদা সুমাইয়া,
গিরগিটি'র প্রথম সম্পাদিকা;
ভাই, তোরে ছাড়া লেখালিখি আসলেই অসম্পূর্ণ,
স্বাদহীন,
ঝালহীন,
রোমাঞ্চহীন,
একদম মসলা ছাড়া তরকারি'র মতো!

বছর দুয়েক আগে লেখা উপন্যাসগুলো এখন ভেঙে ভেঙে খাচ্ছি। জানি না আবার কবে নতুন কিছুর জন্ম হবে, তাই বেঁচে থাকতেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নিচ্ছি। অনেক অনেক বড় হ, আপন আলোয় জ্বলে ওঠ। নিজের যত্ন নে, সাহসী হ, আত্মবিশ্বাসী হ, আনন্দে বাঁচতে শিখ, পাখির মতো উড়; আমি আছি সাথেই, ইন শা আল্লাহ।

ঠিকাছে না, ব্র?

ক থা মু খ

রাতের অন্ধকার আকাশে যখন সাদা গোল চাঁদকে কালো মেঘ গিলে ফেলে, তখন নিজেকে বাঁচানোর আশায় হাত-পা ছুটালেও, নিষ্প্রভতা সব কিছুকে যেনো নিমর্মভাবে খুন করে ফেলে।

সংস্কৃতির অন্যতম রাজধানী 'নেত্রকোনা', ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত; এই জেলাকে একবার অতিক্রম করার জন্য আহ্নিক গতির এক-দশমাংশ সময় যথেষ্ট। তবে অন্ধকারের বুকে এখানে নেমে আসে দোজখ!

নেত্রকোনা'র 'মোক্তারপাড়া' এলাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ বলে এটিকে *শিক্ষার আতুঁড়ঘর* হিসেবে ডাকা হয়। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এখানে গড়ে উঠেছে নানা স্কুল, যার মাঝে কিন্ডার গার্ডেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক অন্যতম। এগুলোকে কেন্দ্র করে আশেপাশে গড়ে উঠেছে নানা আবাসিক স্থাপনা। পুরো জেলা সীমানাগতভাবে ছোটো হওয়ায় সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাগুলো একে অপরের সাথে লাগোয়াভাবে অবস্থিত।

জেলার বিখ্যাত ও শতবর্ষী পুরোনো স্কুল শুধু ছেলেদের জন্য নির্মিত, একদম বয়েজ স্কুল ওটা; নাম *আঞ্জুমান আর্দশ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়* আর মেয়েদের জন্য নির্মিত *নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়;* কিশোর আর যুবক ছেলেদের কাছে যেটি 'হুর-পরীর কারখানা' হিসেবেই বিবেচিত। আঞ্জুমান স্কুলের ঠিক পিছনের বিশাল জায়গাটা ছেলে-মেয়ে-যুবক-যুবতী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবার জন্যই উন্মুক্ত।

বকুলতলা!

কয়েক একরের মতো জায়গার উপর বিশাল বিশাল আকৃতির *বকুল গাছ* যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আড্ডা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছোটো পরিসরে বইমেলা সহ নানা কাজে মুখরিত থাকে এই জায়গাটি; যদিও তা বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য। আর বাকি সময়টা এটি অন্ধকারে জর্জরিত থাকে। সেই অন্ধকারেই ঘটে নানান ভুল, বিদগ্ধ পাপ আর কখনো কখনো বীভৎস অপরাধ! যদিও বা, ভুল থেকেই পাপ এবং পাপ থেকেই অপরাধে ধাবিত হওয়ার চক্রটা খুব কম সময়ের মাঝেই অতিক্রান্ত করে ফেলে যেকেউ। ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ একবার 'অপরাধ' নামের চক্রে প্রবেশ করে, তবে সেখান থেকে 'জীবিত' অবস্থায় ফিরে আসার কোনো সুযোগই থাকে না। মৃত্যুই তখন একমাত্র 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর সুযোগ হয়। তবে কেউ কেউ, ভাগ্যের ব্যতিক্রমতার উদাহরণ হিসেবে বেঁচে ফিরে আসে! আর আসার জন্য তাকে পরিশোধ করতে হয় 'দাদান'।

নেত্রকোনা জেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর যেই ভবন, ওটা ঠিক আঞ্জুমান স্কুলের পিছনে। বিশাল বকুলতলা'র উপর ইংরেজি 'এল' আকৃতির মতো দাঁড়িয়ে আছে ভবন। এর সরু রাস্তা ধরে রাতের আঁধারে হনহন পায়ে হেঁটে আসতে থাকে এক সত্তা। মূল রাস্তার ওপর সাদা আলো প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও 'বকুলতলা' ভিতরে

হওয়ায় আলো ওখানে ঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে না। যদিও ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বাইরে জ্বলতে আলোতে স্পষ্ট হয় ঐ সত্তার অবয়ব, দ্রুত গতিতে যে হেঁটে আসতে থাকে মূল সড়কের দিকে।

নারীসত্তা!

সাদা আলো ক্ষণিকের জন্য নারীসত্তার ওপর পড়লে তার দেহ ও চেহারা স্পষ্ট হয়। হ্যাংলা গড়নের, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আর সাথে মিষ্টি চেহারার ফর্সা চামড়ার নারীর মাথা ওড়না দিয়ে ঢাকা। গায়ে সেলোয়ার কামিজ। চুল ও চেহারা ওড়নার আড়ালে ঢেকে দ্রুত পায়ে হেঁটে যেতে থাকে। দেখে মনে হচ্ছে, যেনো কেউ একজন কিংবা কিছু একটা থেকে ছুটে পালাচ্ছে! ধীরে ধীরে আলো ক্ষীণ হতে থাকায়, নারীসত্তা যখন বকুলতলার মাঠ অতিক্রম করে, তখন মাদক জাতীয় কিছু একটার ঘ্রাণ তার নাকের মধ্যে আসায়, বার কয়েক ঘাড় ফিরে পেছনে তাকায়। কিন্তু কারোর উপস্থিতিই টের না পাওয়ায় হাঁটায় মনোযোগী হয়।

গলি পেরুনোর আগে, মোবাইল বেজে উঠায় কাঁধে থাকা পার্স থেকে ফোন নিয়ে স্ক্রিনে নজর দেয়। নাম দেখে ক্রোধে জ্বলজ্বল করে উঠে চোখগুলো। ক্রোধান্বিত হয়ে 'লাল বাটন' স্পর্শ করে কেটে দেয়, মূলত একপ্রকার জিদের কারণে করে এটা।

💕 লাভ 😚

স্ক্রিনে ইংরেজিতে 'লাভ' লিখে পাশে ভালোবাসার চিহ্ন জুড়িয়ে ফোনকলের সত্তাকে বিশেষ স্থান দিয়েছিলো এই নারীসত্তা। ভালোবাসার মানুষটার উপর কোনো কারণে তীব্র ক্ষোভ ও অভিমান আসায়, ক্রোধান্বিত হয়ে তার কলগুলো বারবার কাটতে থাকে। ঐ একই কাজ ততক্ষণে মোট চারবারের মতো করে ফেলে, কিন্তু পঞ্চমবারের মতো ফোনকলের জবাব দিতে যেনো বাধ্যই হয়। আর যখন জবাব দেয়, তখন বয়ে যায় তাণ্ডব!

"তোর ভালোবাসার গুষ্টি কিলাই, ইফতির বাচ্চা! দরকার নাই তোর প্রেম। ভুলেও তুই আমাকে আর ফোন দিবি না।" জবাব দিয়েই গজগজ করে বলতে থাকে যুব বয়সের নারীসত্তা। "তোর মতো অমেরুদণ্ডী আর কাপুরুষ প্রেমিকের আমার দরকার নাই। তুই যা, তোর লাং'রেই বিয়া কর!" বলেই সে কল কেটে দেয়। স্ক্রিনের দিকে তাকাতেই এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদস্পন্দন হারিয়ে যায়।

১১ : ৩৯

মঙ্গলবার

০৭ জুলাই, ২০১৬

নেত্রকোনা মফস্বল শহর হওয়ায়, মধ্যরাতে একজন যুবতী মেয়ের এভাবে হেঁটে বেড়ানো, যেকোনো মেয়ে ও তার পরিবারের জন্য কলঙ্ক ও ন্যাক্কার বয়ে আনে—ভাবনাটা মস্তিষ্কে আসতেই ক্ষণিকের জন্য তার পিলে চমকে উঠে। যদিও বা ছেলেদের জন্য রাতের বেলা বাইরে থাকা যেনো পান্তা-ভাত, হোক তা মফস্বল কিংবা

রাজধানীতে! ঘড়ির সময় দেখে আরো দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে, বকুলতলা পেরিয়ে ফুটপাতে উঠে স্কুলের সামনে দিয়ে হাঁটতে থাকে। সবর্ত্র রাত নেমে এলেও, স্কুল গেইটে তখন যেনো মাত্র সন্ধ্যা।

সময়ের কালগ্রাসে, স্কুল পড়ুয়া কিংবা স্থানীয় ছেলেরা স্কুলের সামনে অংশকে কিংবা ছয় ফুট দেয়াল ডিঙিয়ে স্কুলের ভিতরের অংশকে ‘নেশাখানা’য় রূপ দেয়। এছাড়া, গত দু’দিন আগেই কোরবানির ঈদ তথা ঈদ-উল-আযহা অনুষ্ঠিত হওয়ায়, এখানকার দোকানপাট সহ সব স্থানেই খানিকটা নীরবতার ছায়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এসবের মধ্য দিয়েই লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে যেতে থাকে।

নারীসত্তা যখন স্কুলের মূল ফটকের সামনে এসে পৌঁছে, ঠিক ঐ সময় স্কুলের দেয়াল টপকে ফুটপাতে নামে ৩ জন কৈশোর বয়সী ছেলে। বড় চুলওয়ালা এক কিশোর ঠোঁটে সিগারেট জ্বালিয়ে বকুলতলার অভিমুখে যাওয়ার সময়ই, নারীসত্তার সাথে দেখা হয়ে যায়। আর তাকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে মূর্তি হয়ে যায় ছেলেটি! ক্ষণিকের জন্য ঠোঁটে জ্বলতে থাকা সিগারেটটি বাতাসেই পুড়ে নিঃশেষ হতে থাকে। কিন্তু যখনই হুঁশ ফিরে আসে, সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে চুল আর পোশাক পরিপাটি করে সটান হয়ে যায় নারীসত্তার দিকে। হড়বড়িয়ে বলে, ‘‘রেণূ আপা, আসসা...”

যদিও বা কথা শেষ করার আগেই ঠাস করে একটা চড় এসে পড়ে তার গালে, সজোরে আঘাত পেয়ে খানিকটা পিছনে ঝুঁকে পড়ে, নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

“হারামজাদা, এখনো এসব গু খাওয়া ছাড়োস নাই?” আচমকাই গর্জে ওঠে রেণূ। “বদমাইশগুলার সাথে এখনো ঘুরোস, না? কতবার নিষেধ করেছি? ওরা তোরে একদিন ধ্বংস করে দিবে রে, শাকিল।”

“রেণূ আপা, আসলে... মানে... আমি এক...”

“চুপ থাক একদম,” ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে যায়। মধ্যরাতে রেণূর চেঁচানোর আওয়াজ শুনে রিক্সাচালকও মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরে তাকায়। এরপর তারা আবারো নিজ চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। “স্কুল খুললেই তোর আব্বাকে নিয়া আইবি, তোরে টিসি দিয়া দিবো। দরকার নাই তোর মতো ছাত্রের!”

শাকিলের উপর রেণূ’র এভাবে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠা কিংবা স্কুল থেকে বের করে দেওয়া... এহেন ক্রুদ্ধ আচরণের একমাত্র কারণ যে তার ভালোবাসার মানুষের মাঝেই লুকানো আছে, তা এ মুহূর্তে ঠিক কেউই বুঝে উঠতে পারে না, অনুভবও করতে পারে না। আর ভুল বুঝাবুঝি কিংবা তর্কের ফলে উৎপন্ন হওয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতিই যে একটা নির্দিষ্ট ফলাফলের কারণ হয়ে উঠে, তা আসলে তখন কেউই বুঝতে পারে না।

“আপা! মানে... ম্যা... ম্যাডাম! এমন কইরেন না।” রেণূকে *আপা ও ম্যাডাম* বলে সম্বোধন করে আঞ্জুমান স্কুলের মাধ্যমিকের ছাত্র শাকিল। নেত্রকোনা শহরটা ছোটো এবং সবার সাথে সবার আন্তরিকতা ও পরিচিতি থাকায়, সম্পর্কগুলো খুবই সখ্যতা নিয়ে গড়ে উঠে। পেশাগত জীবনে রেণূ আঞ্জুমান স্কুলের সদ্য যোগদানকারী সহকারী

শিক্ষিকা। রেণূ আর শাকিল একই এলাকায় হওয়ায়, রেণূকে ও সবসময়ই 'আপা' বলে সম্বোধন করে এসেছে। কিন্তু কোনো বিপদ কিংবা ভুলের পরে, ভেজা বিড়ালের মতো রেণূকে 'ম্যাডাম' বলে ডেকে উঠে শাকিল; যেমনটা এখন করছে।

অন্যদিকে, ছোটো থেকে চোখের সামনে বড় হওয়া শাকিল এবং তার পরিবারের সদস্যরা রেণূ ও তার পরিবারের অত্যন্ত আন্তরিক হওয়ার পাশাপাশি এলাকাস্থ প্রতিবেশি হওয়ায়, ঠিক কী বলে ডাকছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতো না রেণূ। 'ম্যাডাম' ডাকের চেয়ে 'আপা' ডাকটাই রেণূকে বেশ তৃপ্তি দিতো। কিন্তু আজকে তার মানসিক অবস্থা ঠিক না থাকায়, এক ঘাটের জলকে অন্য ঘাটে মিশিয়ে ফেলার ভুল করে রেণূ। আর এর ফলাফল যে কতটা ভয়ানক ও ভয়ংকর হতে পারে, তা তখনো অব্দি টের পায়নি। শিক্ষিকা হিসেবে, সবার সাথেই, নিজের সর্বোচ্চ দায়িত্ব ও কর্তব্যটা পালন করে যেতে থাকে।

"আব্বাকে এর মধ্যে আইনেন না, আপা।" কথাগুলো বলতে বলতে দু'হাত করজোড় করে রেণূর সামনে কান ধরে উঠাবসা করতে শুরু করে দেয় শাকিল। "আজকেই ছাইড়া দিতাছি, এখনই! আব্বারে কিছু কইয়েন না, আপা।"

শাকিলের কথাগুলো শুনে রেণূ কিছু বলতে যাবে, তখনই ওর মোবাইল বেজে ওঠে আবারো। স্ক্রিনে 'লাভ' নামটা দেখে রাগে সে গজগজ করতে থাকে, যদিও বা ততক্ষণে শাকিল বেশ কয়েকবার কান ধরে উঠা-বসা করে ফেলেছে। ঠিক ঐ সময়েই, ফুটন্ত তেলে পানির ছিঁটানোর মতো ঘটে যায় একটি ঘটনা।

স্কুলের দেয়াল টপকে ফুটপাতের উপর হাজির হওয়া শাকিলের দুই বন্ধু ঐ মুহূর্তে রেণূর সামনেই নতুন করে একটা করে সিগারেট জ্বালায়। রেণূকে অপমান করতে উদ্যোগটা নেওয়া হলেও, এর ভুক্তভোগী যে শাকিলই হবে, তা ওদের চিন্তায় আসেনি। পোশাকে আর হাবভাবে নিজেদের ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে জাহির করলেও, আদতে ওরা মাধ্যমিক পড়ুয়া ছাত্র। অভিভাবকের দায়িত্বহীনতা ও সঠিক শাসনের অভাবে ওরা নিজেদের 'বড়' কিছু ভেবে বখাটের খাতায় নাম লেখায়। আর এজন্য এদেরকে 'বখাটে' আর 'উড়নচণ্ডী' নামে আখ্যায়িত করেছিলো রেণূ। এর আগেও কয়েকবার শাকিলকে ওদের সাথে মিশতে মানা করেছিলো। কিন্তু, প্রকৃত বন্ধুত্ব আসলে কখনোই বংশ-টাকা-চেহারা-খ্যাতি দিয়ে হয় না আর যেগুলো হয় ওগুলো আদতে হয় স্বার্থ বা লোভ।

ওদেরকে 'বদমাইশ গ্যাং' হিসেবে উল্লেখ করে শাকিলের ওপর চেঁচিয়েছিলো রেণূ, শাসিয়েছিলো ওকে। আর এই মুহূর্তে ওদের এই আচরণ দেখে, মুহূর্তেই ক্রোধের আগুনে জ্বলে ওঠে রেণূ। বিরক্তি, অসহায়ত্ব আর বিষণ্নতা ছেয়ে বসে ওর অনুভূতিতে। কীভাবে এগুলো বিভক্ত করবে, তা বুঝতে ব্যর্থ হওয়ায়, দ্বিতীয়বারের মতো শাকিলকে একটা চড় মেরে হনহন পায়ে বেরিয়ে যায় রেণূ। চড় খেয়ে খানিকটা মনঃক্ষুণ্ন শাকিল যখন সঙ্গীদের দিকে তাকায়, এক প্রকার তাচ্ছিল্য ও অপমানের সুর ভেসে ওঠে তাদের চোখে। যা জিদ তুলে দেয় শাকিলের আঘাতপ্রাপ্ত হৃদয়ে।

বিস্তর আকাশের বুকে জেগে উঠা চাঁদ তার সঙ্গী সূর্যকে ঘুম পাড়িয়ে বাকি অর্ধেক কাজ শেষ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসে চোখে চশমা তুলে নেয়। চারদিকের শূন্যসারকে ভুলিয়ে দেয় সাদার মায়ায়।

নেত্রকোনার ‘সাতপাই’ এলাকাটা অন্যান্য এলাকার চেয়ে ঠিক দু’টি কারণে প্রসিদ্ধ, প্রথমটা পার্থিব এবং দ্বিতীয়টা সত্য। পার্থিব বলতে, এই এলাকাতে স্থাপিত হয়েছে ‘নেত্রকোনা সরকারি কলেজ’ নামের এক বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা পুরো জেলা ও উপজেলার মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণ করছে। মাঝেমাঝে কু-আলোও ছড়িয়ে যায় এখান থেকে।

দ্বিতীয়টা তথা সত্যটা হলো ‘গোরস্তান’, ‘কবরস্থান’। জেলার মৃত বাসিন্দাদের রূহ তাদের রবের কাছে ফিরে গেলে মাটির বানানো পঁচা-গলা দেহকে দাফন করতেই সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে এ উদ্যোগ। যেখানে ঘুমিয়ে আছে হাজারো, লাখো নারী ও পুরুষ। শিশু-ও আছে সেই দলে।

গোরস্তানের সামনে, রাতের দ্বিতীয় ভাগে, ব্যাটারিচালিত একটা অটো রিক্সা যখন ধীর পায়ে এসে থামে, সাদা চাঁদ তখন মিষ্টি আলো ছড়াতে থাকে। হুট খোলা রিক্সা থেকে নামে এক নারীসত্তা, মুখে তার মাক্স লাগানো। পাশাপাশি পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত পোশাক গায়ে জড়িয়ে কবরস্থানের গেইটের বাইরে দাঁড়ায়। ভিতরে প্রবেশ নিয়ে দ্বিধায় ভুগতে থাকে।

আর এই দ্বিধাময় অনুভূতি প্রতিটা বছরের জন্যই।

ইসলাম ধর্ম মতে, কোনো নারী কবরস্থান জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গোরস্তানে আসতে পারবে না। তাদের জন্য কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা একজন পুরুষ তুলনামূলকভাবে কঠোর থাকতে পারলেও, একজন নারী (মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা) মৃত ব্যক্তির কবরের সামনে এলে দুর্বল ও আবেগী হয়ে পড়বে এবং সেখানে নানান বিদ’আত ও গায়রে শরয়ী আচরণ বা কাজ করতে পারে বিধায়, তাদেরকে কবরস্থান জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে হানাফী ফীকহ’দের মতে এর দ্বিতীয় ভাগ আছে, যেখানে কবর জিয়ারতকে জায়েয বলা হয়েছে!

এতো সব উৎপীড়ন, সামাজিক রীতিনীতি ও কুণ্ঠিত চোখের দৃষ্টি; সবকিছুর জন্যই কবরস্থানে আসা ও জিয়ারত না করাকেই শ্রেয় মনে করে দূরে ছিলো নারীসত্তাটি, কিন্তু পঞ্জিকার পাতায় আজকের দিনের সূর্য উঠার আগেই শত মাইলের দূরত্ব পাড়ি দিয়ে সে ছুটে আসে সাতপাই কবরস্থানে। এছাড়াও, কবরস্থান জিয়ারতের সময়সীমা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে অবাঞ্ছিত সব ঝামেলা থেকে দূরে থাকতেই, রাতের এই ভাগে আসে। মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ফোন দেয় একটি নম্বরে। কয়েকবার রিং হওয়ার

পর কল কেটে দেয় অপর পাশের সত্তা। খানিকটা সময় অপেক্ষা করে নারীসত্তা আবারো পূর্বের নম্বরটিতে ফোন করার আগেই, কবরস্থানের বদ্ধ ফটকের অপরপ্রান্তে হাজির হয় ফতুয়া-লুঙ্গি পরা ও চাপদাড়ি চেহারার একজন পুরুষ।

কবরস্থানের ভিতরে জ্বলতে থাকা আলোয় পুরুষের চেহারা স্পষ্টত হয়। চেনা-পরিচিত চেহারা দেখে মাস্ক নামিয়ে ফেলে নারীসত্তা, আর মুহূর্তেই স্পষ্টত হয় তার অবয়ব। যেনো সদ্য বয়ঃসন্ধিকাল পেরিয়েছে, এমন কিশোরী সুলভ চেহারাটি উন্মোচিত হয় রাতের আঁধারে। যদিও বা, রাজ্যের সমস্ত বিধ্বস্ততা যেনো পুরাপুরিভাবে উলোট-পালোট করে দিয়েছিলো তার চেহারার নিষ্পাপতাকে। গায়ে বাদামি রঙের চামড়া এবং খানিকটা দীর্ঘ দৈহিক উচ্চতার এই নারীসত্তার চোখগুলো মাঝারি আকারের। আবার, মাটির চুলায় রান্নার দরুণ ওখানে যেই 'কালি'র সৃষ্টি হয়, তা যেনো লেপ্টে আছে তার চোখের নিচে। সেসাথে, বাঁ চোখের ভ্রু-এর অংশ কাটা থাকায়, সেখানে স্থায়ী দাগের সৃষ্টি হয়। যা দিয়ে সহজেই অন্যদের চেয়ে আলাদা করা যায়। পরিচয়পত্রের মতো!

পুরুষসত্তা চেহারায় বিষাদ ও হাসি মিশিয়ে তাকে ভিতরে আমন্ত্রণ জানায়, সদ্য উন্মুক্ত গেইট ধীরে সুস্থে ভিতরে প্রবেশ করে কিশোরী চেহারার নারীসত্তা।

"ধন্যবাদ, রহিম ভাই। আপনি যদি না থাকতেন, তাহলে আমার কখনোই এখানে ঢুকা হতো না।" কথাগুলো শুনে খানিকটা শরম পায় পুরুষ লোকটি। নিষ্পাপ হাসি ফুটে উঠে চোখে-মুখে। "এইটা রাখেন। ভাবি আর বাচ্চাদের জন্য।"

শেষের কথাগুলো বলে পার্স-ব্যাগ থেকে বেগুনি রঙের কয়েকটি নোট বের করে রহিমের এগিয়ে দিতেই, কয়েক কদম পিছিয়ে সে ঐ অর্থ নিতে অস্বীকার জানায়। যেনো টাকা নেওয়া নিষেধ!

"আমাকে দিয়ে এই পাপটা করাইয়েন না, আপামণি। এইডা হারাম।" বলে এবার খানিকটা সামনে এগিয়ে যায়, "এই ট্যাকায় আমার কোনো হক নাই। আমি নিবার পারুম না।"

"এইটা হাদিয়া। আর হাদিয়া তো সুন্নাহ, তাই না?" মুচকি হেসে বলে নারীসত্তা। "হারাম আর হালালের কোনো কথা নেই এখানে। আপনি এইগুলা রাখেন, রহিম ভাই। দাবি করলাম কিন্তু।" গলায় খানিকটা জোর নিয়ে কথাগুলো বলে, যেনো রহিমের করা উপকারে সে কৃতজ্ঞ। এজন্য মনের অব্যক্ত কথাগুলো বলে যেতে থাকে।

"আপনি যে আমার কী উপকার করছেন, রহিম ভাই, তা বলার বাইরে। আপনি না থাকলে আমি ওদের কাউকেই দেখতে পেতাম না। একটু সময় নিয়ে, শান্তি করে, ওদের দেখে কাঁদতেও পারতাম না। সবকিছুই আপনার জন্য সম্ভব হয়েছে।" কথাগুলো বলতে বলতে চোখের কোণায় পানি জমে আসে নারীর, প্রিয়জনদের স্মৃতি ও অনুভূতির কথা মনে হওয়ায় আবেগী হয়ে উঠে। "গোরস্তানের দরজা খুলে আপনি চাকরি হারানোর ঝুঁকি নিয়েছেন। পাহারাদারের চাকরিটাই আপনার রুজি-রুটি। এখন আপনার জন্য যদি এতোটুকুও না করি, তাহলে মনে হবে, আমিই যেনো জুলুম করছি

আপনার উপর! টাকাগুলো রাখেন, রহিম ভাই।” একশ্বাসে কথাগুলো বলে আবারো নোটগুলো বাড়িয়ে দেয় ত্রিশোর্ধ্ব বয়সী পাহারাদার রহিমের দিকে, এমন যুক্তি শুনে অপারগ হয়েই টাকাগুলো নেয়। টাকা হাতে নিতেই মুচকি হাসি ফুটে নারীসত্তার ঠোঁটে।

“ধন্যবাদ, শাণূ আপা। আপনের মনডা অনেক বড়, আল্লায় রেণূ আপা আর আপনের আব্বা-আম্মারে জান্নাত দেক।” কথাটা শেষ হতেই মলিন হয়ে উঠে রহিমের চেহারা, আর কথাগুলো শুনে তখনো নিজেকে শক্ত অবস্থানে ধরে রাখে ‘শাণূ’, ঐ রেণূর ছোটো বোন, এখন যে কী না সবেমাত্র বয়ঃসন্ধি পাড়ি দিয়ে যৌবনে পর্দাপণ করেছে।

নেত্রকোনার ঘুষের বাজার এলাকায়, কোনো এক রাতে, দুর্বৃত্তদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিলো রেণূ। এরপর দীর্ঘদিন কোমায় থাকার পর একদিন হুট করেই জীবিত হয়েছিলো কিন্তু এর কিছু দিনের মাথায় সে মারা গিয়েছিলো। স্বজন হারানোর যাত্রাপথে শাণূ নতুন করে হারিয়ে ছিলো আরো দু’জন মানুষকে। তার পিতা-মাতাকে।

পরিবারের বড় মেয়ের দূর্ঘটনা আর পরবর্তীতে, তার নামে আচমকা কুৎসা রটানোর দরুণ, মানসিক চাপ ও সমাজের শকুনচোখাদের নিবদ্ধ চোখ আশাহত করে ফেলেছিলো পরিবারের দু’জন সদস্যকে। ফলে, রেণূর মৃত্যুর আগে, একদিন ঘুমের মাঝেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছিলো। একমাত্র জীবিত সন্তান, মূলত মেয়ে হওয়ায়, ভয়ানক অনেক কুৎসিত সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলো কিশোরী শাণূ। এরপর বছর কয়েক আগে, বড়বোনও মারা গেলে, তদবির, সহযোগিতা ও পরিশ্রমের পর, পরিবারের তিনজন সদস্যদের কবর সে পাশাপাশি দিতে পেরেছিলো। যদিও বা এর জন্য খরচ হয়েছিলো ভালো পরিমাণ অর্থ! কবর দেওয়ার জন্য জায়গা পাওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত ধাপ সম্পন্ন করতে, এ গোরস্থান হয়েছিলো ‘ধর্ম ব্যবসার’ তীর্থস্থান। ধর্মের নাম নিয়ে আরো কত জঘন্য অপরাধ যে করতে থাকে, এই উপমহাদেশের আবেগী ও মূর্খ মুসলমান জনতা, তা আসলে খোদাই ভালো জানে!

সামাজিক আড়ষ্টতা সত্ত্বেও, প্রতিবছর মৃত্যুবার্ষিকীতে নেত্রকোনা আসার চেষ্টা করে শাণূ। কবর জিয়ারত আর তাদের স্মৃতিকে জীবিত করতেই, প্রতিবছরই ঢাকা থেকে ছুটে আসে। স্মৃতির পাতায় পুরোনো ঘটনাগুলো আরো একবার জীবিত হলে চোখগুলো ছলছল করে উঠে, তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে, তথাকথিত ‘দুর্বল,’ ‘আবেগী’ সহ আরো অনেক তাচ্ছিল্যসূচক শব্দগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, নিজেকে ধরে রাখে সদ্য যৌবনের পা রাখা শাণূ। মুহূর্তেই, হাসিমুখ চেহারা বানিয়ে অতীতের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দিয়ে বর্তমানে ফিরে আসে। স্বাভাবিক হয়ে যায় চোখের পলকে।

“দো’আ করবেন, ভাই।” ছোটো করে বলে। “আমি একটু ওদিকে যাই। আপনি থাকেন।” বলে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে গোরস্তানের ভিতরে চলে যায় শাণূ।

মাথার ওপর চড়ে উঠা সূর্য ক্রোধে ছন্নছাড়, কড়া আগুনে সে ঝলসাতে থাকে চারদিক। তপ্ত দুপুর আর কড়া রোদে, লক্ষ্মণ ভান্ডারীতে তখন হাঁস-ফাঁসের সুর বয়ে যেতে থাকে।

সূর্য যখন খাঁড়া মাথার ওপর গোস্বা ঝাড়তে থাকে, রঙিন ছাতা হাতে নিয়ে, মুখে মাক্স ও সালোয়ার কামিজ গায়ে জড়িয়ে মগড়া নদীর উপরে বানানো ব্রীজ, যা 'নাগড়া শিববাড়ি' এলাকায় অবস্থিত, পার হয়ে শাণূ হাজির হয় বিশেষ এক দরবারে। আইনের দরবারে।

"নেত্রকোনা মডেল থানা, নেত্রকোনা"

চৌরাস্তার সমাহার থেকে কয়েক পা হাঁটতেই বিশাল স্থাপনা নিয়ে আসন পেতেছে জেলা সদরের একমাত্র থানা, সদরের সমস্ত আইনি সহযোগিতা ও অপরাধের দরজা বন্ধ করার জন্য তৈরি হয়েছে এটি।

আধুনিক সাজ সজ্জা ও স্থাপত্য নির্দেশনায় তৈরি থানার পুরো সীমানায় ভবনের সংখ্যা ৩টি, যার একটি ব্যবহৃত হয় আইন রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মবিধির কাজে। তিনতলা ভবনের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় মাঠে 'উন্নত মম শির'-এর মতো দাঁড়িয়ে থাকা লাল সবুজের পতাকার দিকে একবার তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাণূ। এরপর, মাথা নিচু করে ছাতা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে যায় থানার ভিতর।

জেলার কিংবা বড় শহরের সরকারি হাসপাতাল যেমন রোগীদের ভীড়ে গিজগিজ করে, থানার অবস্থাও একই। বিশাল বড় এক কক্ষে সারি সারি টেবিলে পেতে রাখা, মাথার উপরে ফ্যান ঝুলিয়ে রেখে দেশ-সমাজ-জনগণকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। যদিও বা, বেশকিছু ইতর-অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কারণে, ওদের লোভের কারণে, অপরাধের কারণে পুরো পুলিশ জাতিকে লজ্জার ভাগীদার হতে হয়। আর শত কিছুর পরেও, সুবিধাবঞ্চিত, ভুক্তভোগী ও বাদী হওয়া ব্যক্তিগুলো আশ্রয়স্থল হিসেবে উপস্থিত হয় থানাগুলো। শুধু ন্যায়ের আশায়। সুবিচারের প্রত্যাশায়। শাণূও ঐ দলেরই একজন। বাকিদের মতো উত্তরের আশায় সে-ও হাজির হয়। প্রায় ৮ বছর আগে, বড় বোনের উপর ঘটে যাওয়া বীভৎস ও ন্যাক্কারজনক ঘটনার জবাব চাওয়ার জন্য পুলিশের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছে, যদিও কোনো প্রকারের সদুত্তর পেতে সে ব্যর্থ হয়েছিলো। আর যেই উত্তর সে পেয়েছিলো, পুরোটাই তার কাছে গল্পের মতো বানোয়াট আর গাঁজাখুরি মনে হয়েছিলো! কিন্তু আইনের উপর শাণূ ভরসা রেখেছিলো। এজন্য, আজ আবারো প্রতীক্ষিত সেই উত্তরের আশায়, থানায় উপস্থিত হয়েছে।

থানার মূল কক্ষের ভিতরে ঢুকতেই, দরজার একদম বাঁ পাশের টেবিলে বসা পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স্ক পুলিশ কর্মকর্তাকে দেখে মুচকি হাসে শাণূ, আর আচমকাই এতোদিন পর তাকে দেখে পুলিশ কর্মকর্তাও ভরাট মুখে হাসি দেয়। গায়ে জড়ানো পুলিশি পোশাক, কাঁধে থাকা চাপরাস ও বুকের উপর থাকা নামফলক দিয়ে, পদবির পাশাপাশি নামও স্পষ্টত হয়।

আবুল ফজল। হাবিলদার।

নেত্রকোনা মডেল থানায় হাবিলদার পদে চাকরিরত বয়স্ক পুলিশ সদস্য শাণূকে দেখে ইশারায় তাকে বেঞ্চে বসতে বলে। টেবিলের সামনে বসা ভুক্তভোগী ব্যক্তির কথা শুনে, তাকে কয়েক টেবিল পর অন্য এক পুলিশ সদস্যের কাছে পাঠিয়ে শাণূ'র দিকে তাকায়।

"আপনি এতোদিন পরে?" কণ্ঠে আনন্দ আর কৌতূহল মিশিয়ে বলে হাবিলদার আবুল ফজল। মুখে লেপ্টে থাকা মেহেদি লাগানো দাড়ি তার বয়স লুকাতে পারলেও, চামড়ার ভাঁজ লুকানো সম্ভব হয়নি। "হঠাৎ কী মনে করে? সব ঠিক ঠ..." কথাগুলো বলতে গিয়ে মাঝখানে থেমে যায়। ততক্ষণে মনে হয়ে যায়, ঠিক কী কারণে শাণূ তার সামনে বসা। আনন্দ ও কৌতূহলের সুরে বলা কথাগুলো যে আদতে *কাঁটা গায়ে নুনের ছিঁটা* দেওয়ার মতো, তা বুঝতেই জিভে কামড় বসিয়ে অপরাধের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে চেহারায়।

"ভুলে গিয়েছিলাম, স্যরি।" নরম স্বরে জানাল আবুল ফজল। "আপনাকে আসলে অনেকদিন পরে দেখেছি তো, তাই মনে করতে পারিন..."

"এভাবে বলবেন না। প্লিজ।" হাবিলদার আবুল ফজলের কথা শেষ হওয়ার আগেই শাণূ বলে উঠে, এতো লম্বা সময় ধরে পুলিশ সদস্যের কথা বিরক্ত না করলেও, পিপাসিত করে ফেলে। এজন্য, নতুন করে আলোচনা শুরু করে দেয় নিজে থেকে। "গত আট বছরের বেশি সময় ধরে আমি বারবার হতাশ হয়ে ফিরেছি। এই থানার কেউই আমাকে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেনি। সহমর্মিতার হাতও বাড়ায়নি। কিন্তু, আপনি ঠিকই করেছিলেন। এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

বছর আটেক আগে রেণূ'র সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি পুলিশের খাতায় আদতে 'দূর্ঘটনা' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছিলো, যদিও প্রথমদিন থেকেই "পুরো ঘটনাটা একটা হত্যাকাণ্ড, রেণূকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে!" কথাগুলো শাণূ বারবার তদন্তকারী সদস্য সহ বাকিদের বলার পরেও তাতে কেউই কর্ণপাত করেনি। যার দরুণ, প্রথম কয়েক মাস সপ্তাহে প্রতিদিন, এরপর সপ্তাহে তিনদিন, পরবর্তীতে সপ্তাহে একদিন, অতঃপর মাসে একদিন, তিনমাসে একদিন, ছয়মাসে একদিন এবং সবশেষে বছর এক দিনের জন্য... শাণূ উপস্থিত হত নেত্রকোনা মডেল থানায়। রেণূ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে হালনাগাদ তথ্য জানার জন্য! বিগত সাত-আট বছর ধরেই ব্যর্থ হয়ে আসছিলো। এমনকি, ঢাকায় অবস্থান করার সময়ও, পুলিশ বাহিনীর প্রস্তুতকৃত 'পুলিশ কমপ্লেইন

বক্স’-এ বেশ কয়েকবার চিঠি ও ই-মেইল পাঠিয়েছিলো শাণূ, যেখানে ই-মেইলগুলো সরাসরি তত্ত্বাবধান করে বাংলাদেশ পুলিশের ‘আইজি’ পদে থাকা একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তবে, নালিশ বক্সের দৌরাত্ম্য আপাতত ঢাকা মহানগর পুলিশ তথা ডিএমপি’র সর্বমোট ৫০টি থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

নেত্রকোনা মডেল থানার দায়িত্বরত ও কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা যখন শাণূ’র আবেদন, অভিযোগ নালিশ গ্রহণ করতে অপারগ হয়েছিলো, ঠিক ঐ সময়ে অন্ধের যষ্ঠি হয়ে আগমন ঘটে আবুল ফজলের। একজন আর্দশ পুলিশ সদস্য, তারচেয়েও বড় কথা, একজন সৎ মানুষ হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে শাণূকে মানসিকভাবে সাহস দিয়েছিলো। যে কারণে, শাণূও তাকে মনে রেখেছিলো এতোগুলো বছর পরে। পদবির দিকে একদম নিম্নস্তরে থাকায়, হাবিদলার আবুল ফজল উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশে বাইরে যেতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলো শাণূকে।

রেণূর ঘটনার ব্যাপারে কোনো তথ্যপ্রমাণ, চাক্ষুষ সাক্ষী কিংবা ক্ষতি করার কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে না পাওয়ায়, ঘটে যাওয়া ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার তথা আসামীর গ্রেফতার আজ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। ফলস্বরূপ, পুলিশের ডায়েরি ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড হিসেবেও লিপিবদ্ধ হয়নি, বিস্তর কোনো তদন্ত বা অনুসন্ধানও হয়নি।

এছাড়াও, ঐ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শাণূর পরিবারকে জানিয়েছিলো, রেণূর সাথে ঘটা দূর্ঘটনা আদতে একটা আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। রেণূ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলো এবং তদন্তে এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এজন্য এই মামলার তদন্ত সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। যা শুনে মুহূর্তেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলো শাণূ এবং খামচে ধরে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আহত করার চেষ্টাও করেছিলো। যদিও, এই ঘটনায় কোনো মামলা করার ইচ্ছা পোষণ করেনি তদন্ত কর্মকর্তা।

কিন্তু, এরপরেও, প্রতিবারই শাণূ উপস্থিত হতো থানায় এবং পুলিশ সদস্যদের বলতো ঐ রাতের ঘটনা। যা যা সে শুনতে পেয়েছিলো ফোনের অপরপ্রান্তে থেকে। কিন্তু কেউ এর ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। আর তখনই হাবিলদার আবুল ফজলের আগমন হয়েছিলো দৃশ্যপটে। তাকে সাহস ও ভরসা দিয়ে গিয়েছিলো।

এরপর, বাবা-মা’র মৃত্যুর পর শাণূ ঢাকা চলে যাওয়ায়, শুধু বছরে ১ বারের জন্য নেত্রকোনা আসতো, কবর জিয়ারতের জন্য। ঐ সময়ে সে উপস্থিত হতো থানায়, বলে যেতো তার কথাগুলো। যখন শতবারের মতো থানা থেকে নিগৃহীত ও অবহেলিত হয়েছিলো, তখন *আইনের ভঙ্গুরতার বিরুদ্ধে সে আওয়াজ তুলবে এবং তা শুদ্ধ করার প্রয়াস নিবে* শপথ নিলেও, সময়ের সাথে যুদ্ধ করে সে নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত হয়। ক্ষোভ, রাগ, অভিমান, কান্না... এসবের কাছে হেরে পুনরায় হাজির হয় নেত্রকোনায়। যদিও বা এবারের যাত্রা শাণূর কাছে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে ব্যতিক্রম ও পরিকল্পিত, যার ফলে চেহারায় ভাসতে থাকে আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া।